গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা | ২১ - ২৭ জুলাই ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

মহান নেতার শিক্ষা থেকে

"মালিক-মজুরের মধ্যে চলছে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে লেবার এবং ক্যাপিটালের, (শ্রম ও পুঁজির) গ্রোয়িং প্রোডাক্টিভ ফোর্স (ক্রমবর্ধমান উৎপাদিকা শক্তি) আর এগজিস্টিং প্রোডাকশন রিলেশনের (প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের) মধ্যে যে অ্যান্টাগনিস্টিক দ্বন্দ্ব (বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব), এই দ্বন্দ্বের থেকে সমাজচেতনায়, সমাজের ভাবগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমাজ বিপ্লবের ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। সেই ধারণা আকাশে ঘুরে বেড়ায় না। সঙ্গে সঙ্গেই পারসোনিফায়েড (ব্যক্তিকৃত) হচ্ছে এই সমাজের কতকগুলো শিক্ষিত মানুষের মধ্যে। শিক্ষিত মানুষগুলো যে কোনও অবস্থায় থাকুক না কেন, তারা বুঝতে পারে এবং ফিল করতে পারে যে, আমি এক্সপ্লয়েটেড ও হিউমিলিয়েটেড (অপমানিত) কন্ডিশনে

চারের পাতায় দেখুন

৫ আগস্ট ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি সারা দেশে

দিন বদলের স্বপ্নকথা, সারি সারি লাল পতাকা/ আঁধার বেয়ে নতুন ভোরের আলো/প্রতি রাতে একটু করে উঠছে ফুটে স্বপন জুড়ে.../ শোষণ পীড়ন দীর্ণ বুকে, জাগছে আশা দিকে দিকে/ খুঁজছে মানুষ নতুন পথের দিশা.../ রাত জাগা ওই গানের সুরে/ হচ্ছে লেখা দেওয়াল জুড়ে/ ৫ আগস্ট চলো ব্রিগেড চলো

রবিবারের বৃষ্টিভেজা সকালে কলকাতার ইস্টার্ন বাইপাসের হরেক শব্দ ঠেলে মাথা তুলছিল গানটার সুর। একদল ছেলেমেয়ে সাইকেলে মাইক বেঁধে ডাক দিয়ে যাচ্ছে বাজারে আসা লোকজনকে— যেতে হবে ভাই ব্রিগেড। তাঁরাও কান পেতে শুনছেন, হাত নাড়ছেন, এগিয়ে দিচ্ছেন সাহায্যের হাত।

কিন্তু কী আছে এই ডাকে, কেন তা এত সাড়া জাগাচ্ছে! 'ব্রিগেড চলো'র আহ্বান তো কিছু কম শোনেনি বাংলা! কী সেই বৈশিষ্ট্য, যা নতুন এক সুর হয়ে বাজছে মানুষের কানে? খোঁজ মিলল একটু দূরে এসে, বেলেঘাটার এক দীর্ঘ দিনের বামপন্থী সমর্থকের কথায়। তাঁর দলও ওই রবিবারেই মিছিল করেছে এলাকায়। কিন্তু বামপন্থার ঝান্ডাকে তারা ভোট রাজনীতির চোরাগলিতে আটকে ফেলেছে। সেই মানুষটি ডেকে বললেন, আমরা আজ মিছিলে হাঁটি মাথা নিচু করে, আর আপনারা লাল ঝান্ডা হাতে পথ হাঁটেন মাথা উঁচিয়ে। ঠিক তাই, গানের সুরও তো বলছিল— 'খুঁজছে মানুষ নতুন পথের দিশা'। জেলায় জেলায় অন্য বামপন্থী দলের সৎ কর্মীরা

দুয়ের পাতায় দেখুন

ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতিতে সর্বত্র চলছে জোর প্রচার। ছবি ঃ হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

ভোটসর্বস্ব রাজনীতির বলি যুবকরা

পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন ৫৪ জনের বেশি মানুষ খুন হয়ে গেলেন। হাত-পা ভাঙল, মাথা ফাটল, গুলিবিদ্ধ হলেন আরও বহু মানুষ। ঘরছাড়া হতে হল অনেককে। এই মানুষগুলি কারা? বেশির ভাগই সাধারণ মানুষ, সাধারণ যুবক। এঁদের হাতে বন্দুক, পিস্তল, রড, উইকেট ধরিয়ে দিয়ে এই মৃত্যুপথে ঠেলে দিল কারা? কারা এদের পাঠাল তারই মতো আর একজন সাধারণ মানুষকে খুন করতে, মাথা ফাটাতে, ঘর জ্বালিয়ে দিতে? ভোট রাজনীতির অংশীদার যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলির নেতারাই হলেন এর হোতা। স্বজনহারা বহু মানুষের চোখের জল দেখে অনেকেরই চোখ সজল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে-সবই বিজয় মিছিলের আবীরের রঙে আর উদ্দাম ডিজের কান ফাটানো আওয়াজে আড়ালেই থেকে গেছে। রাজনীতিতে কেন এই গুন্ডাতন্ত্রের উদ্ভব?

রাজনৈতিক দল মানে তো দেশের অভিভাবক। তাঁরা দেশকে যেমন করে পরিচালনা করেন দেশ তেমন চলে। নেতারা যে পথ দেখান,

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ সমাপনী সমাবেশে

৫ আগস্ট বেলা ১২টা ব্রিগেড চলো

- প্রধান বক্তা : কমরেড প্রভাস ঘোষ
- বক্তা : কমরেড সত্যবান
- সভাপতি : কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ
- পতাকা উত্তোলন : কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

ভোটসর্বস্ব রাজনীতি

একের পাতার পর

সেই পথেই চলে দেশের মানুষ, বিশেষত দেশের ছাত্র-যুব সমাজ। রাজনৈতিক দলের নেতারাই তো দেশের নীতি নির্ধারণ করেন, সেই নীতি সমাজে, অর্থনীতিতে, শিক্ষানীতিতে, সমাজনীতিতে কার্যকর হয়। তাই দল সঠিক হলে, তার নেতারা সৎ, নীতিনিষ্ঠ হলে সমাজও ঠিক পথে চলে, আর দলের লক্ষ্য যদি জনগণের মঙ্গল না হয়, নেতারা যদি অসৎ হন, অসচ্চরিত্র হন, লোভী, স্বার্থপর হন, তবে সমাজে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। তখন সমাজটাও আর ঠিক থাকে না, ছাত্র-যুবরাও বিপথগামী হয়। বলেছেন, এ যুগের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষ। গত শতকের ছয়ের দশকে বলা তাঁর এই বক্তব্য কত বড় সত্য, ঘটনা পরম্পরা দেখিয়ে দিচ্ছে। এই অপরাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি তুলে ধরেছেন রাজনীতি সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর কথায়, রাজনীতি একটি উচ্চ হৃদয়বৃত্তি। যে হৃদয়বৃত্তি স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রবল ভাবে কাজ করেছিল। পরবর্তীকালে বামপন্থী আন্দোলনেও সঠিক সংগ্রামী ঝান্ডা নিয়ে যাঁরা চলেছেন তাঁদের মধ্যেও তা কাজ করেছে এবং আজও কাজ করে চলেছে। সেই হৃদয়বৃত্তি কোথায় এই ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে?

আজ ভোট-সর্বস্ব দলগুলির এই সব নেতারা কোন পথে নিয়ে যাচ্ছেন দেশের ছাত্র-যুব সমাজকে? এই যে যুবকদের বিরাট এক অংশের হাতে তারা অস্ত্র তুলে দিলেন ভোট রাজনীতিতে ফয়দা তোলার জন্য এবং যুবকরা সে উদ্দেশ্য হাসিল করে এলেন, তাদের এই ভূমিকা কি নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে? না, যাবে না। এই নেতারা কেউ ক্ষমতা ধরে রাখতে, কেউ ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে অর্থাৎ তাঁদের সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে, ব্যক্তিগত স্বার্থে যুবসমাজকে যে অগণতান্ত্রিক, অনৈতিক রাস্তায় ঠেলে দিলেন, সে-রাস্তা এখানেই শেষ হবে না। সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা অনৈতিকতার, বিদ্বেষের বিষ ছড়াতে থাকবে। সত্য, ন্যায়, গণতন্ত্র তাদের হাতে প্রতি মুহূর্তে মার খেতে থাকবে। আর সেই পরিণতি দেখে সমাজের একটি বড় অংশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হবেন, বিরক্তি প্রকাশ করবেন, কপাল চাপড়াতে থাকবেন, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবেন, সমাজটা রসাতলে গেল, সততার, ন্যায়ের কোনও মূল্য নেই— জোর যার মুলুক তার। ইতিমধ্যেই যা বলতে শুরু করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু এই বলেও শেষ পর্যন্ত যদি তাঁরা এই দলগুলির কোনও না কোনও একটির পিছনে গিয়ে দাঁড়ান, এ-কথা ও-কথা বলে তাদেরই সমর্থন করেন, তবে তো এই প্রতারণার রাজনীতি, ভণ্ড রাজনীতি, জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করা রাজনীতিই সমাজজুড়ে জাঁকিয়ে বসে থাকবে এবং সাধারণ মানুষও এই দুষ্টচক্র থেকে কোনও দিনই বের হতে পারবে না।

আর যে নেতারা যুবকদের নিরুপায় বেকার জীবনকে কাজে লাগিয়ে টাকার বিনিময়ে, চাকরির লোভ দেখিয়ে অনৈতিকতার পথে ঠেলে দিলেন, তাঁরা কি আদৌ অভিভাবকের কাজ করলেন? কমরেড শিবদাস ঘোষ বহু দিন আগেই বলেছিলেন, শাসক পলিটিক্যাল পার্টিগুলো আজ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। পয়সার বিনিময়ে নেতারা এইসব যুবকদের দিয়ে পার্টির কাজ করাচ্ছে। তাদের দিয়ে পোস্টার মারাচ্ছে। জাল ভোট, ছাপ্পা ভোট দেওয়াচ্ছে, বুথ দখল, বিরোধীদের উপর সন্ত্রাস চালাতে যত রকম উপায় আছে সে-সব কিছুই তাদের দিয়ে করাচ্ছে।

এই যুবকরা কি আদৌ রাজনৈতিক কর্মী? রাজনৈতিক কর্মী মানে তো সমাজকর্মী— যারা সমাজের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করে, শোষণ বঞ্চনা নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এ-সবের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করে। কোথায় তাদের সেই ভূমিকা? সমাজকর্মী হিসাবে গড়ে তোলার পরিবর্তে এই নেতারা তো তাদের সমাজবিরোধী হিসাবে গড়ে তুলছেন। ভোট-সর্বস্ব দলগুলি ডান-বাম নির্বিশেষে যে যখন ক্ষমতায় থেকেছে এই রাজনীতিরই চর্চা করে চলেছে। গত পঞ্চাশ বছরের ভোট রাজনীতির ইতিহাস দেখলে কংগ্রেস-সিপিএম সব আমলেই এই রাজনীতির পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যাবে।

আজ দেশ তথা সমাজের যে বিষময় পরিণতি, তা কি এই সব নেতাদের নীতিহীন, লোভী, স্বার্থপর আচরণের জন্যই নয়? এদের হাতে দেশের ভবিষ্যতের ভার ছেড়ে দিয়ে জনগণ কি আদৌ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? সেই ভবিষ্যতে তবে আশা করার কিছু থাকে কি? সমাজসচেতন প্রতিটি মানুষকে আজ এগুলি ভেবে দেখতে হবে।

আজ যে-সব যুবক এই সব নেতাদের হাতে এ ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছেন, তাঁদেরও কথাগুলি গভীর ভাবে ভেবে দেখতে হবে যে, তাঁরা এ ভাবে এই নীতিহীন অসৎ নেতাদের হাতের পুতুল হিসাবে ব্যবহৃত হবেন, নাকি প্রকৃত যুবকের মতো মর্যাদার জীবন বেছে নেবেন! টাকার বিনিময়ে অন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবেন, অন্যায় করবেন, নাকি সাহসের সাথে অন্যায়ের মোকাবিলা করবেন! মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, প্রকৃত যুবক আমরা তাকেই বলি, যার মর্যদাবোধ আছে, লড়বার তেজ আছে এবং যে অন্যায়ের মোকাবিলা করার সাহস রাখে।

যুব সমাজের পাশাপাশি সমাজের সমস্ত স্তরের সাধারণ মানুষকেও আজ ভাবতে হবে, এই দলগুলিরই একটির বদলে আর একটিকে ক্ষমতায় বসিয়ে এই ভয়ঙ্কর দুরবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। তার কারণ, এই দলগুলি আজ যে রাজনীতির চর্চা করে সেই বুর্জোয়া রাজনীতি আজ আদর্শ হিসাবে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেছে, পচে গেছে। এই রাজনীতি আজ আর দেশের ছাত্র-যুব সমাজকে আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না, মর্যাদাবোধ দিতে পারে না, সমাজের, মানুষের মুক্তির জন্য লড়াইতে এগিয়ে দিতে পারে না। তাই এই রাজনীতি আজ প্রাণ দিতে শেখায় না, প্রাণ নিতে শেখায়। এই রাজনীতি আজ সমাজের জন্য ত্যাগ করতে শেখায় না, ব্যক্তিগত স্বার্থে সামাজিক সম্পত্তি লুঠ করতে শেখায়। এই দুষ্ট রাজনীতি যে মানুষ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে— কমরেড শিবদাস ঘোষের এই বক্তব্য আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। তাই যতদিন এই ভোট-রাজনীতি টিকে থাকবে ততদিন এ ভাবে একটার পর একটা ভোট আসবে আর এই দলগুলির নেতারা তাদের দুষ্ট রাজনীতির দ্বারা ছাত্র-যুবকদের একটা অংশকে কলুষিত করতে থাকবে, সমাজবিরোধী হিসাবে তৈরি করবে। নতুন করে আরও এক দল ছাত্র-যুবক ক্রিমিনালে পরিণত হবে। আজ এই মারণ-রাজনীতির হাত থেকে যদি ছাত্র-যুব সমাজকে বাঁচাতে হয়, যদি আমাদের নিজেদের সন্তানদের বাঁচাতে হয় তবে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, এই দুষ্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছে সেই জনস্বার্থের রাজনীতিকে, গণআন্দোলনের রাজনীতিকেই শক্তিশালী করতে হবে— যে রাস্তা দেখিয়েছেন মার্ক্সবাদী নেতা শিবদাস ঘোষ।

প্রস্তুতি সারা দেশে

একের পাতার পর

খোঁজ নিচ্ছেন— আমাদের যখন অনেক এমএলএ এমপি ছিল আমরা ফ্রন্টের সব দল মিলে ব্রিগেড সমাবেশ ডাকতাম। আপনাদের এমএলএ-এমপি কিছুই নেই, একার শক্তিতে কী করে ভরাবেন ব্রিগেডের মাঠ? উত্তর আসছে, বিপ্লবী রাজনীতির শক্তির বিচার এমএলএ-এমপি-র নিরিখে হয় না, হয় গণআন্দোলনের নিরিখে। এ ক্ষেত্রে জনগণের কাছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পরীক্ষিত এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দল। প্রতিটি আন্দোলনে জনগণের যে বিপুল সমর্থন আমরা পাই, তার উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। সেই সমর্থনই প্রতিদিন আমরা ব্রিগেডের প্রচারে পাচ্ছি। এ ব্রিগেড তো শুধু লোক ভরানোর, শক্তি দেখানোর ব্রিগেড নয়। এ সমাবেশ সংগ্রামী জনতার। তাই প্রহর গুনতে শুরু করেছে কলকাতা— আসছে ৫ আগস্ট, যেতে হবে ব্রিগেড।

বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত, ভারতের নানা রাজ্যে খোঁজ নিতে বোঝা গেল সত্যিই এক ঘুম ভাঙানিয়া আহ্বান আজ পৌঁছেছে দেশের নানা প্রান্তে। রাত জেগে ছাত্র

পূর্ব মেদিনীপুরের নোনাকুড়িতে ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি সভা। বক্তব্য রাখছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু

যুবকরা দেশের প্রান্তে প্রত্যন্তে দেওয়াল লিখনে ফুটিয়ে তুলছেন সেই ডাক— ৫ আগস্ট ব্রিগেড চলো। শুধু দেওয়াল লিখনে নয়, অনেক রাজ্যেই ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে সেই আহ্বান জানানো লিফলেট। পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার থেকে সুন্দরবনের কোলে জটার দেউল সর্বত্রই চলছে অসংখ্য ছোট ছোট গ্রুপ বৈঠক। কোথাও কুড়িজন, কোথাও পঞ্চাশজন, কোথাও বা শতাধিক মানুষ পাড়া বৈঠকে শপথ নিচ্ছেন— এ দেশের খেটেখাওয়া মানুষের মুক্তি আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে নতুন পথের দিশা দেখিয়েছেন যে মানুষটি, সেই মহান নেতা শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষের সমাপনী সমাবেশ উপলক্ষে যেতেই হবে কলকাতা। শত শত বাজার, হাট, জনবহুল মোড়, পাড়া ধরে ধরে মাইক দিয়ে প্রচার মানুষের নজর কেড়েছে ইতিমধ্যেই। কয়েক লক্ষ মানুষের সমাবেশের এতবড় প্রস্তুতি, কিন্তু বড় বড় সংবাদমাধ্যমে যে তার খোঁজ মিলবে না। কথাটা জানেন পাড়ায় পাড়ায় বৈঠকে যোগ দেওয়া সাধারণ মানুষও। তবে কি প্রচারের ঢেউ উঠবে না, পৌঁছবে না ঘরে ঘরে এই ডাক! খবরের কাগজ, টিভি, রেডিও-র বিকল্পর সন্ধানও জানেন তাঁরা— নিবিড় প্রচার। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ শিবদাস ঘোষের আদর্শে গড়া রাজনীতি শেখায় মানুষের জীবনের সাথে নিবিড় হয়ে মিশে থাকার পথেই পরাস্ত করা যাবে শোষকশ্রেণির সকল আক্রমণকে।

কলকাতার বহু জায়গায় ফুটপাথবাসী মানুষও গ্রুপ বৈঠকে অংশগ্রহণ করছেন। বৈঠকে বসছেন পরিচারিকারা, বস্তিবাসীরা। দেখা যাচ্ছে বহু রেল স্টেশনে যাতায়াতের পথে পরিচারিকারা অল্প সময় দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রস্তুতির কথা সেরে নিচ্ছেন। কাজের বাড়িতে তাঁদের অনেকে বলে দিয়েছেন, ৫ আগস্ট আসতে পারবেন না, চেয়েছেন চাঁদা। নতুন মর্যাদায় ভাস্বর হয়ে ওঠা শ্রমক্লিষ্ট মুখগুলোকে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। অন্য দিকে বৈঠকে বসছেন জাতীয় এবং রাজ্য স্তরের প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ছাত্ররা। গভীর আগ্রহে শুনছেন আলোচনা, বুঝতে চাইছেন মার্ক্সবাদের আলোকে শিবদাস ঘোষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে দিশা রেখেছেন তার পথকে। আলোচনায় বসছেন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজের অধ্যাপক, স্কুল শিক্ষকরা। আলোচনা সভায় মিলিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথিতযশা চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মীরা। বিশিষ্ট শিল্পী, সাংবাদিক, অবসরপ্রাপ্ত আমলা তাঁরাও নতুন করে চিনতে চাইছেন শিবদাস ঘোষকে। কলকাতা সহ রাজ্য জুড়ে অসংখ্য কর্মী সভা, ঘরোয়া সভায় যোগ দিচ্ছেন দলের কর্মী সমর্থকের বাইরেও বহু মানুষ। পথ খুঁজছেন তাঁরা। উত্তরবঙ্গ থেকে আসবেন হাজার হাজার মানুষ। তার জন্য বিশেষ ট্রেন বুক না করে উপায় নেই। জেলায় জেলায় ঠিক করতে হচ্ছে প্রচুর বাস। শুধু মুর্শিদাবাদ থেকেই ৫৫-৬০টি বাস চাই। এছাড়াও ভাগ করে উঠতে হবে নানা ট্রেনে। একই রকমের প্রস্তুতি চলছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, রায়দিঘী, পাথরপ্রতিমা, ডায়মন্ডহারবার, জয়নগর, কুলতলি, বারুইপুরে— বাদ নেই কোনও জায়গা। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার আদিবাসী, অ-আদিবাসী

পাঁচের পাতায় দেখুন

জনসংখ্যা নয়, পুঁজিবাদই তৈরি করছে খাদ্যসংকট

কান পাতলে শোনা যায়, ইন্ডিয়া 'ডিজিটাল' হচ্ছে। অর্থাৎ দেশ প্রযুক্তিতে দারুণ উন্নতি করছে। কৃষি, শিল্প সব ক্ষেত্রেই উন্নত প্রযুক্তি আসছে, ফসল উৎপাদনের নিত্য নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার হচ্ছে। পরিশ্রম আর সময় বাঁচানোর অর্থাৎ কম সময়ে বেশি উৎপাদন করারও নানা উপায় এসেছে। অথচ দারিদ্র-অপুষ্টি-অনাহার বাড়ছে ক্রমশ, ক্ষুধাতালিকায় নিচের দিকে নামছে দেশ। এমনকী শিশুরাও প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবারটুকু পাচ্ছে না। বাড়ছে শিশুমৃত্যুর হার, শিশু অপুষ্টি। এসব কেন ঘটছে, প্রশ্ন তুললেই এক দল ধুরন্ধর বলেন, আরে মশাই ওসব বলে লাভ নেই। পপুলেশন না কমলে কিচ্ছু করা যাবে না। এত মানুষ যাবে কোথায়, এতজনের খাবার, চাকরি জোগাবে কে? তাঁদের মতে, জনসংখ্যাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। সমাজের যাবতীয় সংকট, বেকারি, অপুষ্টি ইত্যাদির জন্য দায়ী নাকি ওই 'পপুলেশন'। তাদের মতে, জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে বলেই সবার খাদ্য মিলছে না, সবার কাজ জুটছে না।

গভীরে ভাবলে বোঝা যায়, এই প্রচার কতখানি ফাঁপা। সত্যিই কি সবার জন্য খাদ্য নেই? বাজারে, শপিং মলে গেলে থরে থরে সাজানো খাদ্যপণ্য। বাজারে খাবারের অভাব কি আদৌ দেখা যায়? এ ছাড়া অপুষ্টিতে ভুগছে কারা? কখনও শোনা গেছে, আম্বানি-আদানির মতো শিল্পপতি বা তাদের পরিবারের কারও খাবার বা কাজ বা অন্য কোনও কিছুর অভাব হয়েছে? এ সমাজে একটা ছোট শিশুও জানে, যত অনাহার যত বেকারি যত অভাব-অনটন সব শুধু নিচের তলার খেটে খাওয়া মানুষের জন্য। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের দুর্দশা যতই বাড়ছে, মুষ্টিমেয় এক শ্রেণির সম্পদও ততই ফুলেফেঁপে উঠছে।

বিগত দু' বছরের করোনা অতিমারির কথাই যদি ধরি, আমাদের দেশে হঠাৎ ঘোষিত লকডাউনে যখন গোটা দেশের পরিবহন অবরুদ্ধ, পরিযায়ী শ্রমিকরা মাইলের পর মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরছেন, পথশ্রমে অনাহারে অসুস্থতায় মারা যাচ্ছেন, লক্ষ মানুষের কাজ চলে যাচ্ছে, হাসপাতালের বেডে অক্সিজেনের অভাবে মানুষ ছটফট করতে করতে মারা যাচ্ছে, সেই সময়ই কিন্তু আম্বানি আদানি সহ দেশের বড় বড় শিল্পপতিরা একশো গুণ দুশো গুণ মুনাফা বাড়িয়েছেন। বিশ্বের ধনকুবেরদের তালিকায় ভারতের অনেক পুঁজিমালিক নতুন করে স্থান পেয়েছে। গোটা দেশের টালমাটাল অর্থনীতির আঁচটুকুও তাদের গায়ে লাগেনি। সুতরাং, দেশে সম্পদ নেই, খাদ্য নেই এমন নয়। টন টন খাবার গুদামে পচে নষ্ট হচ্ছে, দাম না পেয়ে অসহায় চাষিরা নিজের শ্রম নিংড়ে ফলানো ফসল জ্বালিয়ে দিচ্ছে বা ফেলে দিচ্ছে এ তো আমরা হামেশাই দেখি। তা সত্ত্বেও দারিদ্র-অভাব এর কথা উঠলেই জনসংখ্যা কমানোর প্রশ্ন তোলা হয় কেন?

আসলে এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের অনেকেরই এটা নিজস্ব মত নয়। বাজারচলতি মিডিয়া, ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপের মতো মাধ্যম মূলত এমনটাই প্রচার করে থাকে। এমনকি স্কুল-কলেজের বইতেও দারিদ্রের কারণ হিসাবে 'জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই একটা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে দেখানো হয়। এর তীব্রতা বোঝাতে কেতাবি নাম দেওয়া হয় 'জনবিস্ফোরণ'। প্রচার এমনভাবে চলে যে, বেশিরভাগ মানুষেরই তলিয়ে ভাবা বা তথ্য-পরিসংখ্যান মিলিয়ে দেখার কথা মনে থাকে না। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেশিরভাগ দেশের সরকার-প্রশাসন এবং তাদের টাকায় চলা নানা প্রতিষ্ঠান এই প্রচারে একেবারে সামনের সারিতে থাকে। আমাদের দেশেও যে সরকারই ক্ষমতায় থাক, তারা মাঝে মাঝেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসা সরকারগুলোর মানুষের প্রতি দায়িত্ব, নাগরিকের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান এর অধিকার সব পিছনে চলে যায়, সামনে আসে শুধু ওই জনসংখ্যা। ভাবখানা এমন, যেন মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এসেই এই সাধারণ মানুষগুলো মহা অপরাধ করে ফেলেছে, প্রবল সদিচ্ছা সত্ত্বেও এতগুলো মুখে অন্ন তুলে দিতে অপারগ হচ্ছেন ক্ষমতায় থাকা কেষ্টবিষ্টুরা। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই এই 'ক্ষতিকর জনসংখ্যা বৃদ্ধি'-র প্রচার চলে। আমাদের দেশের বর্তমান সরকারের মতো কেউ কেউ এর সাথে ধর্মপরিচয়কে যুক্ত করে নোংরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতিও টেনে আনে। অথচ, বাস্তবে অবস্থাটা আসলে কী? অর্থনৈতিক সংকট, খাদ্যসংকট সব দেশেই কমবেশি বাড়ছে কেন? সত্যিই কি উৎপাদিত খাদ্যের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি বলেই অভুক্ত থাকতে হচ্ছে মানুষকে? লন্ডনের একটি সংস্থা 'ওয়ার অন ওয়ান্ট' এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা কিন্তু একেবারে দুয়ে দুয়ে চার এর মতো মিথ্যে প্রমাণ করেছে 'জনসংখ্যার জন্যই খাদ্যাভাব'— এই মনগড়া ধারণাকে।

সমীক্ষার ফল বলছে, গোটা বিশ্বে প্রতিদিন মাথাপিছু যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়, তা একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক চাহিদার ২.৬ গুণ। অর্থাৎ, বিশ্বের সমস্ত মানুষের প্রতিদিনের পেটভরা খাবার জুগিয়েও বাড়তি হওয়ার কথা আড়াই গুণ খাদ্যসম্পদ। অথচ, পৃথিবীর ২.৩ বিলিয়ন মানুষ (এক বিলিয়ন মানে ১০০ কোটি) প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য পান না। খাদ্য উৎপাদনও তো এক জায়গায় থেমে নেই। যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ২০০৫ থেকে ২০২০ এই পনেরো বছরে পৃথিবী জুড়ে উৎপাদন অনেক বেড়েছে। চাল, গম, ভুট্টা, আখ এবং নানা ধরনের ফল এর উৎপাদন বেড়েছে ৫০ শতাংশের বেশি, সমস্ত ধরনের সবজির উৎপাদন বেড়েছে ৬৫ শতাংশ, দুধ এবং মাংসের জোগান বেড়েছে ৫৩ এবং ৪০ শতাংশের কাছাকাছি। অথচ একই সাথে প্রতি বছর বেড়েছে অপুষ্ট, অভুক্ত মানুষের সংখ্যা। এই রিপোর্টেই বলা হয়েছে, পৃথিবীর প্রতি সাত জন মানুষের একজন পেটে খিদে নিয়ে শুতে যাচ্ছেন রোজ। তা হলে বাড়তি খাদ্য গেল কোথায়? এই অদ্ভুত গরমিল এর কারণ কী? কারণ হিসেবে ওই সমীক্ষাই তথ্য দিয়ে দেখিয়েছে, বীজ-চাষের উপকরণ-সার থেকে শুরু করে খাদ্যের পরিবহন, বণ্টন সহ সম্পূর্ণ খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং, সাধারণ বাজারে কোন খাদ্য কোন দামে কতটা আসবে, চাষি কত দামে বীজ পাবেন, আদৌ চাষের জন্য দরকারি সার ইত্যাদি কিনতে পারবেন কি না, সব নিয়ন্ত্রণ করছে একচেটিয়া পুঁজি। এই নিয়ন্ত্রণ, এই কেন্দ্রীভবন যত তীব্র হচ্ছে, তত বাড়ছে অপুষ্টি, অনাহার। সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে, গোটা বিশ্বের খাদ্যবীজের বাজারের ৫৮ শতাংশ এবং কৃষি-রাসায়নিকের বাজারের ৭৭.৬ শতাংশ দখল করে রেখেছে মাত্র ছ'টি কর্পোরেট সংস্থা। বিশ্বের ২.৫ বিলিয়ন মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবন-জীবিকার জন্য যে জমির ওপর নির্ভরশীল, তাও চলে যাচ্ছে একচেটিয়া পুঁজির দখলে। দেশে দেশে চাষযোগ্য কৃষিজমি দখল করে কর্পোরেট সংস্থাগুলোর মুনাফা লোটার খবর তো আজ কারও অজানা নয়। পরিণামে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ যে কৃষিজমির ওপর নির্ভরশীল, তা এসে ঠেকেছে মোট চাষযোগ্য জমির ৩০ শতাংশে।

একই সাথে চলছে গরিব দেশগুলোর ওপর প্রথম বিশ্বের তথাকথিত উন্নত দেশগুলোর শোষণ। যেমন, বিশ্ব ব্যাঙ্কের ২০১৮-র একটি রিপোর্ট বলছে, সোমালিয়া জুড়ে বিপুল পরিমাণ চাষযোগ্য জমি রয়েছে, রয়েছে আরও কৃষি সম্প্রসারণের, মাছ চাষের এবং পশুখাদ্য বাণিজ্যের বিপুল সুযোগ। অথচ সোমালিয়ায় কী মারাত্মক দুর্ভিক্ষ-খাদ্যাভাব! সুতরাং, এই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করে কারা ফুলেফেঁপে উঠছে এবং তার মূল্য সোমালিয়ার হাজার হাজার অভুক্ত সাধারণ মানুষ নিজেদের প্রাণ দিয়ে কী ভাবে চোকাচ্ছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মায়ানমার এর মতো দেশগুলোর ক্ষেত্রেও কমবেশি একই কথা প্রযোজ্য। গোটা বিশ্বের প্রায় ৮৬ শতাংশ খাদ্যশস্যের জোগান দেওয়া এইসব দেশে অপুষ্ট মানুষের সংখ্যা বাড়ছে ক্রমশ। এতকিছুর পরেও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি যে খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছে, সেগুলো যাচ্ছে কোথায়? এক তৃতীয়াংশ খাদ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাজারে মানুষের কাছে পৌঁছানোর আগেই। কোথাও গুদামঘরে দিনের পর দিন জমছে সেসব, জমে জমে নষ্টও হচ্ছে প্রচুর। কারণ, সেগুলোর 'লাভজনক বিক্রি' নেই। অর্থাৎ, যে দামে বাজারে ছাড়লে পুঁজিমালিকদের মুনাফার খিদে মেটে, সে দামে কেনার ক্ষমতা নেই বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের। নেই কেন? কারণ আবারও সেই পুঁজির শোষণ। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদন করে সমাজের সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ মিলে, অর্থাৎ উৎপাদনের চরিত্র সামাজিক। কিন্তু উৎপাদনের যন্ত্র কুক্ষিগত করে রেখেছে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি মালিক। উৎপাদন হচ্ছে দেশের মানুষের প্রয়োজন মেটাতে নয়, পুঁজিমালিকদের সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে এবং সেটা সম্ভব হচ্ছে ওই ব্যক্তিমালিকানার কারণেই। সুতরাং, মুনাফা এতটুকু কম হলে মালিক বা মালিকশ্রেণি পণ্য বাজারে ছাড়ে না। খাবার গুদামে পচুক, রাস্তায় পড়ে নষ্ট হোক, মানুষ না খেয়ে মরুক, তাতে এই পুঁজিপতি বা তাদের অনুগ্রহে ক্ষমতায় বসা সরকারগুলোর কিছু এসে যায় না। কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হলে মুনাফা চাই, বিভিন্ন স্তরের পুঁজির তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে পুঁজির ক্রমশ কেন্দ্রীভবন এবং তার পরিণতিতে মানুষের ওপর আরও তীব্র শোষণ চলছে।

মানুষের শ্রমই সভ্যতা গড়ে, ফসল ফলায়, যাবতীয় পণ্য তৈরি করে। সুস্থ সমাজে মানুষ কখনও বাড়তি বোঝা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। বরং জনসংখ্যা বাড়লে সেই মানুষের শ্রম দেশের উন্নতিতে লাগার কথা। পুঁজিবাদ তা হতে দিতে পারে না বলেই সে উৎপাদিত দ্রব্যের অধিকার থেকে মানুষকে তো বঞ্চিত করেই, অতিরিক্ত উৎপাদন আটকাতে এমনকী বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অবাধ বিকাশের পথেও বাধা সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই চরিত্র বিশ্লেষণ করে ১৮৬৫ সালের একটি চিঠিতে কার্ল মার্কস এর সুযোগ্য সহযোদ্ধা এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন, 'উৎপাদনের সীমা এখানে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা দিয়ে নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় পকেটভর্তি টাকা আছে এমন ক্রেতার সংখ্যা দিয়ে। বুর্জোয়া সমাজ আর উৎপাদন হতে দিতে চায় না, চাইতে পারেও না। যে নির্দোষ মানুষগুলো, ক্ষুধার্ত পেটগুলো তার মুনাফার জোগান দিতে পারে না, পণ্য কিনতে পারে না, তাদের জন্য মৃত্যুই এখানে একমাত্র ভবিতব্য।' আসলে খাদ্যসংকট তৈরি হয় এই শোষণ, এই মুনাফাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য, আর এই সত্যকে চাপা দিতে দুনিয়া জুড়ে পুঁজিপতিদের এবং তাদের সেবাদাস দলগুলোকে জনবিস্ফোরণের ঢাক পেটাতে হয়। যাতে শোষিত, বঞ্চিত মানুষকে বোঝানো যায়, তাদের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী তারাই, পুঁজিবাদ নয়।

প্রকাশিত হল

শিবদাস ঘোষ রচনাবলি
চতুর্থ খণ্ডের হিন্দি অনুবাদ

মহান স্ট্যালিনের শিক্ষা

"পুঁজিবাদী বৃহদায়তন উৎপাদনের যুগ, আর এই উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণিই প্রধান ভূমিকা পালন করতে থাকে এবং উৎপাদনের প্রধান কাজগুলির দায়িত্ব তাদের হাতেই চলে আসে। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক ছাড়া একদিনও উৎপাদন চলতে পারে না (এখানে সাধারণ ধর্মঘটের কথা স্মরণ করা যায়) এবং এই ব্যবস্থায় উৎপাদনে পুঁজিপতিদের প্রয়োজনীয়তা দূরে থাক, তারা বরং উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এ থেকে কী বোঝা যায়? বোঝা যায়, হয় সমস্ত সমাজজীবন সামগ্রিকভাবে ভেঙে পড়বে, না হয় শ্রমিক শ্রেণি আজ হোক কাল হোক অনিবার্যভাবেই এই আধুনিক উৎপাদনের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেবে এবং তারাই হবে এর একমাত্র মালিক— সমাজতান্ত্রিক মালিক।

আধুনিক শিল্প সংকট পুঁজিবাদী সম্পত্তির মৃত্যুঘণ্টা বাজাচ্ছে। এই সংকট আজ সরাসরি এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে— পুঁজিবাদ না সমাজতন্ত্র? আর এই সংকটই এই প্রশ্নের উত্তর কী হবে তা চূড়ান্তভাবে দেখিয়ে দিয়েছে এবং পুঁজিপতিদের পরগাছা চরিত্র উদঘাটিত করে সমাজতন্ত্রের বিজয়কে অনিবার্য করে তুলেছে।

'সর্বহারা সমাজতন্ত্র অনিবার্য'— মার্ক্সের এই সিদ্ধান্তের এই হল আর একটা ইতিহাস প্রদত্ত প্রমাণ।

সর্বহারা সমাজতন্ত্র কোনও ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এই সমাজতন্ত্র কোনও বিমূর্ত 'ন্যায়' বা সর্বহারা শ্রেণির প্রতি ভালবাসা থেকেও আসেনি। উপরে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর এই সর্বহারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।"

নৈরাজ্যবাদ না সমাজতন্ত্র, জে ভি স্ট্যালিন

জলপাইগুড়িতে তৃণমূলের সন্ত্রাস

পঞ্চায়েত নির্বাচনে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানী অঞ্চলের মাহানপাড়া ও ভোলাপাড়া বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের উপর ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়ে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে। উল্লেখ্য, ভোলাপাড়া বুথে গত ২৫ বছর ধরে এস ইউ সি আই (সি) জিতে এসেছে।

গত বারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সেখানকার তৎকালীন পঞ্চায়েত সদস্য ও দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড নাসিরউদ্দিন সহ অন্যান্য কর্মীদের উপর প্রবল আক্রমণ চালায়, জামিন অযোগ্য ধারায় মিথ্যে মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করে। এ বারেও পুরনো কায়দায় প্রথমে হুমকি, পরে মারধর এবং তাতেও তাঁদের দমাতে না পেরে ৯ জনের নামে জামিন অযোগ্য ধারায় মিথ্যা মামলা করে। তৃণমূল গুন্ডাদের আক্রমণে দলের কর্মী কমরেড মসিরুল ইসলাম মাথায় ও বুকে আঘাত নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ভর্তি।

এই প্রবল সন্ত্রাসের আবহে আর কোনও দল ওই বুথগুলিতে প্রার্থী দিতে পারেনি। একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) দলের কর্মীরা সমস্ত আক্রমণের মোকাবিলা করে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

ত্রিপুরায় বিক্ষোভ এআইডিএসও-র

সকল ছাত্রছাত্রীর কলেজে ভর্তি সুনিশ্চিত করা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ, বর্ধিত ফি প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন দাবিতে ১১ জুলাই ত্রিপুরার আগরতলায় উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে স্মারকলিপি পেশ করে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও

দার্জিলিংয়ে রক্তদান শিবির

দার্জিলিং জেলায় এআইডিওয়াইও-র সুশ্রুতনগর মেডিকেল ইউনিটের পক্ষ থেকে ২ জুলাই রক্তদান শিবির হয়। গভীর আবেগের সঙ্গে এলাকার মানুষ রক্তদানে এগিয়ে আসেন। কমরেডস রাজু রায়, মিঠুন বর্মন ও মহাদেব সাহা এই কর্মসূচির উদ্যোগ নেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা ইনচার্জ কমরেড ধনঞ্জয় রায়।

কেরালায় প্রতিবাদ সভা

মণিপুরে বিজেপির বিভেদ তৈরির ঘৃণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে ৩০ জুন দলের ডাকে দেশজোড়া প্রতিবাদ দিবসে কেরালার এর্নাকুলামের সভায় বক্তব্য রাখছেন খ্যাতনামা অধ্যাপক ভিনসেন্ট মালাক্কাল

কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে জৌনপুরে সভা

এ যুগের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী দার্শনিক এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে দলের পূর্ব উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির উদ্যোগে জৌনপুরে কালেক্টরেট অধিবক্তা সংঘ সভাঘরে ৯ জুলাই একটি সভা হয়। জৌনপুর, প্রতাপগড়, সুলতানপুর, এলাহাবাদ, মউ, গাজিপুর, বালিয়া সহ অন্যান্য জেলাগুলি থেকে বহু সংখ্যায় ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষক-মহিলা ও বুদ্ধিজীবীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য অফিস সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ বর্মা এবং সভা পরিচালনা করেন দলের পূর্ব উত্তরপ্রদেশ সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড রবিশঙ্কর মৌর্য। উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী।

মহান নেতার শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

রয়েছি। আমার বিবেক, মনুষ্যত্ব পদদলিত হচ্ছে। আমার মধ্যে যে মানুষটা রয়েছে, সে মাথা উঁচু করে তার স্বাভাবিক বিকাশের রাস্তা পাচ্ছে না। এই উপলব্ধির জন্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতির জ্ঞান থাকা দরকার।

আবার এদের ডি-ক্লাসড (শ্রেণিচ্যুত) হতে হবে। এরাই শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বিপ্লবের চেতনা নিয়ে যাবে। এটাই লেনিন দেখিয়েছেন। এ ভাবে এই সব মানুষের মধ্যে মুক্তির চেতনা ধাক্কা দেয়, বিপ্লবের চিন্তাটা ধাক্কা দেয়। দেওয়ার পর সেইখান থেকে তৎক্ষণাৎ তারা সেটা সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করে।

এ ভাবেই সোসালিস্ট মুভমেন্ট, যাকে আমরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বা বিপ্লবী আন্দোলন বলি, সেই আন্দোলনের জন্ম হয়।"

বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়

শিবদাস ঘোষ

দেশ জুড়ে চলছে ৫ আগস্ট ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি

রাধাকান্তপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

পাটনা, বিহার

কোচবিহার

দুয়ের পাতার পর

মানুষ সকলে মিলে ব্রিগেড পৌঁছনোর জন্য প্রস্তুতি সারতে ব্যস্ত। কত বাস ট্রেন, পায়ে হাঁটা পথ যে তাঁদের পেরিয়ে আসতে হবে— যা অন্যসময় কষ্টকর। কিন্তু এমন আহ্বান যেখানে শরীরের কষ্ট পিছনে পড়ে থাকে মনের টানে। একই সঙ্গে এত আয়োজনে চাই প্রচুর টাকা, দরিদ্র মানুষ মুষ্টি মুষ্টি করে চাল জমিয়ে যেমন করে তীর্থযাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করতেন অতীতে, ঠিক তেমন করেই টাকা একজোট করছেন তাঁরা। আত্মীয়-স্বজন পরিচিত অপরিচিত সকলকে বলে রাখছেন যেমন পারো সাহায্য দিও বাপু। এ যে সকলের কাজ। এই দল তো টাটা-বিড়লা-আম্বানি-আদানিদের দল নয়, যে চাইলেই কোটি কোটি টাকা এসে যাবে! এর সম্পদ ছড়ানো আছে গরিবের ঘরেই। একটু একটু করে টাকা জমিয়েছেন তাঁরা এক বছর ধরে। কুলুঙ্গিতে গোঁজা বহুবার মোড়া নোটগুলো হাত দিয়ে একটু সোজা করে তাঁরা তুলে দিচ্ছেন দলের হাতে। প্রতিকূলতা ডাক সব কিছুকে ছাপিয়ে যায়। প্রস্তুতি চলছে কৃষক পরিবারে। চাষের মাঠেও চলছে আলোচনা।

স্কিম ওয়ার্কার, চটকল শ্রমিক, হকার, সংগঠিত-অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যেও চলছে প্রস্তুতি। হুগলি নদীর দুই পারের শিল্পাঞ্চলও বাদ যায়নি। বহু কারখানার গেটে, শ্রমিক মহল্লায় চলছে সভা। ট্রান্সপোর্ট শ্রমিকরা পালা ঠিক করছেন কে কখন কাজ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবেন ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতির কাজে। ছাত্ররা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে, ক্লাস রুমে আলোচনায় বসছে। পাড়ায় পাড়ায় হচ্ছে যুব সংগঠনের বৈঠক। নারী আন্দোলনের কর্মীরাও এলাকায় এলাকায় করছেন বৈঠক।

শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতেই চলছে এই প্রস্তুতির কর্মযজ্ঞ। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে এসইউসিআই(সি) আজ সর্ববৃহৎ বামদল। রাজ্যকে একাধিক জোন ভাগ করে হয়েছে শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ পালনের তাৎপর্য সংক্রান্ত আলোচনা। চলছে দেওয়াল লিখন। কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানার নানা শহরের নানা মহল্লায় দেওয়াল সেজে উঠেছে ৫ আগস্টের আহ্বানে। দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন এমন বহু মানুষ আসবেন দক্ষিণ ভারত থেকে ব্রিগেড সমাবেশে। দেওয়াল জুড়ে ব্রিগেড চলোর আহ্বান আর মহান নেতা শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি ফুটে উঠেছে উত্তরপ্রদেশের বেনারস, এলাহাবাদ, জৌনপুর, প্রতাপগড়, লক্ষ্ণৌ সহ নানা শহরের দেওয়ালে। মধ্যপ্রদেশে ভোপাল, জব্বলপুর, গুনা, গোয়ালিয়র, অশোকনগর সহ ৪০ জেলায় হয়েছে প্রচার। দেওয়াল লিখন তো আছেই, তার সাথে ছোট বড় সভা হচ্ছে প্রায় সব শহরে। গুনা গোয়ালিয়রে শিশু কিশোরদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং আজকের মুক্তি সংগ্রামে শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নিয়ে নানা আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান চলছে। ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লি, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থানেও নানা শহরে নানা ভাষায় দেওয়ালে ফুটেছে কলকাতা চলো লেখা। উত্তর ভারতে সাম্প্রতিক বন্যার মধ্যেও সাধ্যমতো ত্রাণকার্যের পাশাপাশি কর্মীরা প্রচার করছেন শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে কলকাতার ব্রিগেডের সভার কথা। এতদূর আসতে গেলে শুধু টিকিট নয় আছে পথ খরচ, সংগ্রহ চলছে সেই তহবিলও। আহ্বান পৌঁছেছে উত্তরাখণ্ডে। গাড়ওয়াল জেলার শ্রীনগরে ছাত্র-যুবরা জোট বেঁধেছেল কলকাতা আসার। হিমাচল প্রদেশের মাটিতেও হয়েছে আলোচনা সভা। বিহার থেকে আসবেন বহু মানুষ, রিজার্ভ করতে হচ্ছে বিশেষ ট্রেন।

ঝাড়খণ্ডের কয়েক হাজার মানুষ আসবেন চলতি ট্রেনগুলিতে অথবা বাসভাড়া করে। বিপুল জমায়েত হবে ওড়িশা থেকে। এই রাজ্যে তাঁরা দুটি ট্রেন ইতিমধ্যে রিজার্ভ করার পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। এ ছাড়াও বেশ কিছু বাস লাগবে তাঁদের। আসাম জুড়ে চলছে অসংখ্য সভা। বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁরা প্রচারের কাজ থামাননি। পিছিয়ে নেই ত্রিপুরা, অনেক দূরের রাস্তা ঠেলে কলকাতা পৌঁছানো সহজ নয়, কিন্তু তাতে কি পিছিয়ে যাওয়া চলে?

হ্যাঁ, প্রহর গুনছে কলকাতা, প্রহর গুনছে দেশের বামপন্থী মানুষ, প্রহর গুনছেন কৃষক শ্রমিকরা— বাঁচার পথ খুঁজতে, শোষণের অবসান চাইতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সঠিক উপলব্ধি শিবদাস ঘোষের আদর্শকে আজ বুঝে নিতে হবেই। শোষিত শ্রমজীবী মানুষ বুঝবে এটাই রাস্তা।

শিয়ালদা কোলে মার্কেট

ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ

রাসবিহারী, দক্ষিণ কলকাতা

বেলুড়, হাওড়া সদর

কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবার্ষিকীতে দার্জিলিং জেলার সুশ্রুত নগরে আলোচনাসভা

পাঠকের মতামত

রাম-রহিমের রক্তপাত কেষ্ট-বিষ্টুর রমরমা

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক বিরোধীর দাপাদাপি, মিটিং মিছিলে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার প্রতিযোগিতা, নেতা-নেত্রীদের একে অপরকে দেখে নেওয়ার হুমকি। পরিণতি— শাসক এবং বিরোধী পক্ষের কর্মী-সমর্থকের একের পর এক মৃত্যু। যাঁরা মারা গেলেন তারা সবাই দিন আনা-দিন খাওয়া পরিবারের মানুষজন। এইসব মর্মান্তিক মৃত্যু কিছু বার্তা দিয়ে গেল কি?

দেশের প্রতিটা নির্বাচনেই চাষি, মজুর, খেটে-খাওয়া পরিবারের মানুষজন মারা যান। হাসপাতালের মর্গে, রাস্তার আনাচে কানাচে যে মৃতদেহগুলো নিস্তব্ধ পড়ে থাকে, যাদের পরিবারের কান্নার ছবি খবরের কাগজে, টিভির পর্দায় ভিড় করে তারা কেউই আদানি, আম্বানি, বিড়লা, টাটার পরিবারের আত্মীয় পরিজন নয়। কোনও এক অদৃশ্য কারণে গণতন্ত্রের নিশান বহনের সব দায় শুধু তাঁদের, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে জমিতে ফসল ফলে, কারখানায় পণ্য উৎপাদিত হয়।

ভোট এলেই বাতাসে ভাসে বারুদের গন্ধ। নির্বাচনী প্রচারের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে বোমা, গুলি, বন্দুকের আওয়াজ। লাফিয়ে বাড়ে লাশের সংখ্যা। কীসের জন্য এই হানাহানি? মারামারি? শাসক শ্রেণিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের জন্য? বিপ্লবের জন্য? নিশ্চিত উত্তর 'না'। এ লড়াই আসলে পুঁজিপতি শাসকের রাজনৈতিক ম্যানেজার নির্বাচনের লড়াই। সাধারণ মানুষ এখানে শুধুই দাবার বোড়ে। এরা লড়ে, এরা মরে।

গণতন্ত্রের পাহারাদাররা নির্বাচন নিয়ে যতই বড়াই করুক, যতই তারা বলুক যে নির্বাচনী ব্যবস্থা এমন এক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনগণ তাঁদের প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে থাকেন, গণতন্ত্রে গণদেবতাই শেষ কথা— বাস্তব কি তাই? আসলে নির্বাচন একটা প্রহসন। সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর একটা দীর্ঘমেয়াদি কৌশল, যার মাধ্যমে পুঁজিপতি শাসক শ্রেণি বছরের পর বছর রাষ্ট্র ক্ষমতায় বহাল থাকে তার রাজনৈতিক ম্যানেজারের পরিবর্তনের কার্যক্রম। যখনই কোনও স্তরে ক্ষমতায় থাকা কোনও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তৈরি হয়, শাসক শ্রেণি তার অনুগত গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে জনমত তৈরি করে ওই বিশেষ রাজনৈতিক দলটিকে সরিয়ে অন্য দলকে ক্ষমতায় আনে। ভাবখানা এমন যেন ওই দলকে সরিয়ে অন্য দলকে আনলে সব সমস্যার সমাধান হবে। আমরাও নিজেদের অজান্তেই এই ফাঁদে পা দিয়ে থাকি। এ যুগের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্পর্কে বলেছেন, 'একটা সরকারের বিরুদ্ধে যখন জনগণ বীতশ্রদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে তখন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আর একটা সরকার আসে। সাধারণ মানুষ কতগুলি লোককে অসৎ মনে করে। ভাবে, সেই লোকগুলিকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় অন্য কতগুলি সৎ লোক এসে বসলেই তাদের মঙ্গল হবে। এ ধরনের প্রচার বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা করে থাকে। কাজেই আমি শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বলছি, তাঁরা যেন এই ধরনের ভাঁওতায় না ভোলেন। ...ভোটের মারফত হাজার বার সরকার পাল্টে বা আক্ষরিক অর্থে আইনকানুন সংশোধন করার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। এই মুক্তি অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সঠিক বিপ্লবী কায়দায় পরিচালনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জনসাধারণের অমোঘ সংঘশক্তি গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা।'

স্বাধীনতার পর থেকে দেশে এবং রাজ্যে বহু বার সরকার পরিবর্তন হয়েছে। ক্ষমতার মসনদে লাল, নীল, হলুদ, সবুজ জামা পরা নতুন নতুন রাজনৈতিক দল কিংবা তাদের জোটের আবির্ভাব হয়েছে। সাধারণ মানুষের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেনি, তাঁদের জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি। বেকারত্ব দূর হয়নি, ক্ষুধা-মন্দাও দূর হয়নি। খবরের কাগজ খুললেই দেখা যায় কারখানা বন্ধ, লে-অফ, শ্রমিক ছাঁটাইয়ের খবর। ফসলের উপযুক্ত দাম না পেয়ে, ঋণ শোধ করতে না পেরে কৃষকের আত্মহত্যার খবর। সামাজিক অবক্ষয় বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে আশি বছরের বৃদ্ধা কিংবা আট বছরের নাবালিকাও ধর্ষণের শিকার। ড্রাগের নেশায় আসক্ত সন্তানের হাতে বাবা-মার খুন হয়ে যাওয়ার মর্মান্তিক ঘটনাও খবরের কাগজের পাতায়, টিভির পর্দায় হামেশাই দেখা যায়। নারী পাচার, শিশু পাচার আজ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এইসব দেখতে দেখতে আমাদের কেমন যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে। অন্য দিকে আমাদের দেশের শিল্পপতিদের সম্পদ বৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো। বিশ্বের তাবড় শিল্পপতিদের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আমাদের দেশের শিল্পপতিদের ধনসম্পদ। ফোর্বসের ২০২৩ সালের বিলিয়নেয়ারদের তালিকা অনুযায়ী শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি ভারতের তথা এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি বিশ্বের প্রথম দশজন ধনীর তালিকাতেও জায়গা করে নিয়েছেন। ফোর্বস ২০২৩ সালের ধনী ব্যক্তির তালিকায় শিল্পপতি গৌতম আদানি, শিব নাদাল, সাইরাস পুনাওয়ালা, লক্ষ্মী মিত্তল, সাবিত্রী জিন্দাল, দিলীপ সাংঘভি, রাধাকৃষ্ণ দামানির নাম উঠে এসেছে।

এ বছরের জানুয়ারি মাসে অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল ভারতের আর্থিক বৈষম্য সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে মাত্র ১ শতাংশ সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির হাতে রয়েছে ভারতের ৪০ শতাংশের বেশি সম্পদ। বিপরীতে আর্থিক সক্ষমতার দিক থেকে জনসংখ্যার নিচের দিকের ৫০ শতাংশের হাতে রয়েছে মোট সম্পদের মাত্র ৩ শতাংশ। তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশের সরকারের সংগৃহীত মোট জিএসটির ৬৪ শতাংশ আসে এই দরিদ্রতম ৫০ শতাংশ জনগণের থেকে। দেশের ধনীতম ১০ শতাংশ থেকে সংগৃহীত জিএসটির পরিমাণ সংগৃহীত মোট জিএসটির মাত্র ৪ শতাংশ।

নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভোট আসে, সাধারণ মানুষ সেই ভোট প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে, কখনও সখনও শাসন ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলের পরিবর্তন হয়, আর সাথে অতিরিক্ত প্রাপ্তি বলতে শুধু মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, মৃত্যু, রক্তপাত, গরিবের আরও গরিব হওয়া কিংবা ধনীর আরও ধনী হওয়ার গল্প, আর আমাদের আশেপাশে থাকা অল্প কিছু কেষ্ট-বিষ্টুর একতলা থেকে তিনতলা বাড়ি, ভাঙা সাইকেল থেকে দামী গাড়ি। সাধারণ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরে।

জিশু সামন্ত
খানাকুল, হুগলি

টমেটোর দাম ও খড়ের পুতুল সরকার

কলকাতার বিভিন্ন বাজারে এখন টমেটোর দাম ১৫০ থেকে ২০০ টাকা কেজি। এক মাস আগে যে টমেটোর দাম ছিল ২৫ থেকে ৩০ টাকার মধ্যে, এখন তার দাম ৬ থেকে ৭ গুণ বেড়েছে। এটা কি কোনও স্বাভাবিক বৃদ্ধি? কৃষক যখন টমেটো বাজারে নিয়ে আসে তার দাম থাকে দেড়-দুই টাকা কেজি। এটাও কোনও স্বাভাবিক দাম নয়। কৃষক এই অস্বাভাবিক কম দামে বিক্রি করে লোকসানের শিকার হয়ে চাষে উৎসাহ হারায়, ঋণগ্রস্ত হয়, আত্মহত্যা করে। আবার প্রতিবাদী কৃষক রাস্তায় টমেটো ডাঁই করে ফেলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে, তার উপর সীমাহীন বঞ্চনার প্রতিবাদ জানায়। প্রতি বছরই এই পরিচিত দৃশ্য দেখা যায়। শুধু দেখা যায় না পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে খড়ের পুতুল সদৃশ সরকারের ভূমিকা।

সব খাদ্যপণ্যেরই দাম অস্বাভাবিক বেড়েছে। শুধু বেঁচে থাকার রসদ জোগাতে অধিকাংশ মানুষের রোজগার চলে যাচ্ছে। রাজ্যে খাদ্য দপ্তর বলে একটা বিভাগ আছে। তার একজন মন্ত্রী আছে, প্রতিমন্ত্রী আছে, বহু সংখ্যক আমলা-অফিসার আছে। এদের পুষতে জনগণের ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এদের কাজ কী? খাদ্যের দাম ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে বেঁধে রাখতে এদের ভূমিকা কী? এই খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে খাদ্যমন্ত্রীর একটা বিবৃতি পর্যন্ত শোনা গেল না। টাস্কফোর্স নামক যে ঢোঁড়া সাপ রাজ্যে গঠন করা হয়েছে, জনগণের প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে সে কলকাতার দু-একটা বাজারে গিয়ে 'দাম বেশি নেওয়া যাবে না' বাণী দিয়েই নবান্নের ঠাণ্ডা করে ঢুকে পড়েছে। তাদের কথা মতো ব্যবসায়ীরা কেমন দাম নিচ্ছে? টমেটো বিক্রি করছে মাত্র কুড়ি টাকা শ। এদের ভয়ে দোকানদাররা কেজিতে দাম বলতে পারছে না।

গুগল সার্চ করে জানা গেল, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর নাম জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। আরও জানা গেল তিনি ইতিপূর্বে কয়েক টার্ম খাদ্যদপ্তর সামলেছেন। যে মিডলম্যানরা, যে কালোবাজারি চক্র পণ্যের বাজার নিজেদের বজ্জায় নিয়ে এসে কেনার সময় জিনিসের দাম কমায়, আর বিক্রি করার সময় দাম বাড়ায়, তারা খাদ্যমন্ত্রী তথা এই সরকারের ভূমিকায় মহা খুশি। তারা দু'হাত উজাড় করে এই সরকারকে ক্ষমতায় থাকার জন্য মদত দিচ্ছে। কারণ সরকার নিষ্ক্রিয় থেকে এদের বিপুল মুনাফা করার সুযোগ করে দিয়েছে। ফল ভুগছে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, গরিব মানুষ।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, পোকার উপদ্রব, বৃষ্টি, প্রতিকূল পরিবেশের জন্য এ বছর টমেটোর উৎপাদন কম হয়েছে। তার উপর সাম্প্রতিক বন্যার দরুন কর্নাটক, মহারাষ্ট্র থেকে টমেটো আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। কিন্তু এটা কি কোনও নতুন বিষয়? সবাই জানে, কৃষি প্রকৃতিনির্ভর। আবার প্রতি বছর বন্যার জন্য মাল পরিবহনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়—সেটাও অজানা নয়। এই অস্বাভাবিকতার জন্য দাম কিছুটা বাড়তে পারে। তাই বলে ৫০০ শতাংশ দাম বৃদ্ধি? এটা কি পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়ম? পুঁজিবাদী অর্থনীতির অতি মুনাফার লোভ চরিতার্থ করতেই পুঁজির জোরে বলীয়ান কালোবাজারি ও মুনাফাখোরদের চক্র সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে এই বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

যে সরকারের হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার, দেশ পরিচালনার ভার, তারা এ ভাবে দেশ সেবার নামে পুঁজিপতিদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। জনতার স্বার্থ কেবল ভোটের ভাষণ রূপেই থেকে যাচ্ছে।

খাদ্য ভর্তুকির টাকায় প্রধানমন্ত্রীর নাম লেখা ফলক!

কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রকের নির্দেশ, মোদি সরকারই যে বিনামূল্যে রেশনের পুরো খরচ দিচ্ছে, তা সবাইকে জানাতে ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার রেশন দোকানের বাইরে ফলক বসাতে হবে। সেই ফলক বসানোর খরচও আসবে খাদ্য-ভর্তুকির টাকা থেকেই। ফলক বসানোর খরচের টাকা কোথা থেকে আসবে খাদ্য নিগম জানতে চাওয়ায় কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, খাদ্য ভর্তুকির টাকা থেকেই ফলক বসিয়ে প্রচার হবে।

'প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা'র নাম থাকলেও সেই বাড়তি রেশন তুলে দেওয়া হয়েছে। খাদ্য সুরক্ষা আইনে যে চাল-গম দেওয়া হত, শুধু সেটাই বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। তাও গরিবের জন্য খাদ্য-ভর্তুকির টাকায় প্রধানমন্ত্রীর প্রচার!

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮-৬-২৩)

বিশ্বে সামরিক খাতে ব্যয় বেড়ে ২ লক্ষ ২৪ হাজার কোটি টাকা

যুদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

আজ থেকে বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।’ তাঁর এই সতর্কবাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। একদিকে ‘সুন্দর’, ‘বিপন্মুক্ত’ পৃথিবী গড়ার কথা বলছেন দেশনেতারা, অন্য দিকে বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক অস্ত্র উৎপাদন করে একের পর এক দেশে যুদ্ধ বাধিয়ে হাজার হাজার মানুষকে প্রাণে মারার নিখুঁত পরিকল্পনা করছেন। তার জন্য ফি-বছর সামরিক খাতে খরচ রেকর্ড হারে বাড়িয়ে চলেছে নানা দেশের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা। দেখা যাচ্ছে, ২০২২ সালে বিশ্বে সামরিক খাতে মোট ব্যয় ৩.৭ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২২৪০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ২ লক্ষ ২৪ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে যে তিনটি দেশ— আমেরিকা, চীন এবং রাশিয়া, তারা বিশ্বের মোট সামরিক খরচের ৫৬ শতাংশ ব্যয় করে এই খাতে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিপরি)-র প্রকাশিত রিপোর্টে উঠে এসেছে এই বিপজ্জনক তথ্য। তা হলে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের অন্তরের আকাঙ্খা যে ‘যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই’ তা কি শুধু স্লোগানই থেকে যাবে?

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কার্যকলাপে সেই আশঙ্কাই দৃঢ় হচ্ছে। তারা বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ উন্মাদনা জিইয়ে রাখতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উৎপাদন এবং কেনাবেচা করছে। দুর্বল দেশগুলিকে অস্ত্র সরবরাহ করছে এবং একটা দেশের সাথে অন্য দেশের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে অস্ত্রবাজারকে চাঙ্গা রাখছে। রাশিয়া, ইউক্রেন কোনও দেশের সাধারণ মানুষই যুদ্ধ চায় না। তা সত্ত্বেও এক বছরের বেশি চলছে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পরিণামে পৃথিবীর নানা দেশে দারিদ্র, অনাহার আরও ভয়ঙ্কর হচ্ছে তা জানা সত্ত্বেও কোনও দেশের শাসকই যুদ্ধ বন্ধের কোনও চেষ্টা করছে না। উল্টে ইউক্রেনকে ভয়ানক সব মারণাস্ত্র দিয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে সাহায্য করছে আমেরিকা, জার্মানি, ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের নানা দেশ। অন্য দিকে তারা ইউক্রেনকে যুদ্ধজোট ‘ন্যাটো’র সদস্য করতে চেষ্টা চালাচ্ছে। আগেও এইভাবে আমেরিকা বছরের পর বছর ধরে লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান সহ নানা দেশে আক্রমণ চালিয়ে ‘গণতন্ত্র’ রক্ষা করেছে! কখনও কোনও দেশকে ‘সাহায্য’ করার নামে, অথবা দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ দুটি দেশের মধ্যে ‘শান্তিস্থাপনে’র নামে এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে মিলিটারিতে ‘সুপারপাওয়ার’ আমেরিকা।

বিশ্বের নানা দেশে সামরিক খাতে ব্যয়ের বহর দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন দেশগুলির আর্থিক সঙ্কটের বিষয়টি। এই খাতে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে আমেরিকা। ২০২২-এ এই খাতে ৮৭৭ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে বিশ্বে সর্বাধিক যুদ্ধাস্ত্র তৈরির এই দেশ। বিশ্বের মোট ব্যয়ের ৩৯ শতাংশই খরচ করে আমেরিকা। দ্বিতীয় দেশ চীন ব্যয় করেছে ২৯২ বিলিয়ন ডলার। ২০১৩ সালে এই খাতে চীন যা খরচ করত এখন তার থেকে ৬৩ শতাংশ বেশি খরচ করছে বেকারত্বে জর্জরিত এই দেশ। ন্যাটোর সদস্যভুক্ত দেশগুলি ২০২২-এই শুধু ১২৩২ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। রাশিয়ায় সামরিক ব্যয় বেড়েছে ৯.২ শতাংশ অর্থাৎ ৮৬.৪ বিলিয়ন ডলার, যা দেশের জিডিপি-র ৪.১ শতাংশের সমতুল্য। সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া ২০২১ সালের সামরিক বাজেটের থেকে ৩৪ শতাংশ এমনিতেই বাড়িয়েছে। সেজন্য দারিদ্র, বেকারিতে জর্জরিত দেশের সাধারণ মানুষের কাছে শাসকগোষ্ঠী যুক্তি দিচ্ছে, ইউক্রেনে আগ্রাসন এতদিন চলবে তা তারা নাকি বুঝতে পারেননি। অর্থাৎ নিজেদের দায়মুক্ত করতে সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধির দায় কার্যত ইউক্রেনের ঘাড়েই ঠেলে দিয়েছে। যুদ্ধ চালিয়ে যেতে মরিয়া ইউক্রেনও ইদানীং কালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খরচ করেছে সামরিক খাতে। ২০২২-এ ইউক্রেন অস্ত্র আমদানিতে পঞ্চদশ থেকে এগিয়ে তৃতীয় স্থানে এসেছে। বিশ্বের সব সাম্রাজ্যবাদী দেশই হয় ইউক্রেন, নয় রাশিয়াকে সহযোগিতা করার নামে শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে একবিংশ শতাব্দীর ভয়াবহ এই ধ্বংসলীলায়। এভাবে নিজেদের অস্ত্রবাজারকে চাঙ্গা রাখছে তারা।

ভারতও সামরিক বাজেটবৃদ্ধিতে পিছিয়ে নেই। অস্ত্র আমদানিতে শীর্ষে রয়েছে ভারত। ভারত কখনও আমেরিকা কখনও রাশিয়া উভয় দেশের সাথে সু-সম্পর্ক রেখে সামরিক সম্ভারে প্রথম সারিতে উঠে আসতে চাইছে। সম্প্রতি আমেরিকা সফরে গিয়ে বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি চুক্তি করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে তিনশো কোটি ডলার মূল্যের ৩০টি হামলাকারী ড্রোন কেনা, আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক-এর ভারতের ‘হ্যাল’-এর সঙ্গে একত্রে যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন তৈরি ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে সমুদ্রপথে নজরদারির জন্য আমেরিকা থেকে লিজে নেওয়া ড্রোনের (সি গার্ডিয়ান) মেয়াদ বাড়ানোর চুক্তিও। সম্প্রতি ফ্রান্সের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে ভারত। এভাবেই ‘দেশপ্রেমিক’ সাজছেন আমাদের দেশের নেতা-মন্ত্রীরা। আর তাঁদের ‘সৌজন্যে’ খালি পেটে ঘুমোতে যাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষকে যুদ্ধবিমানের মহড়া দেখেই খুশি হতে হচ্ছে! ‘দেশপ্রেমের’ জিগির তোলা এই যুদ্ধবাজ শাসকরা দেশের সৈন্যদের প্রাণ বাজি রেখেই এই সব কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বে সামরিক ব্যয়ে চতুর্থ স্থানাধিকারী দেশ ভারত ২০২২-এ ৮১.৪ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৮ হাজার ১৪০ কোটি টাকা খরচ করছে, যা ২০২১ সালের থেকে ৬ শতাংশ বেশি। ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া কৃষক আত্মহত্যা করছে, কাজ না পাওয়া বেকার যুবক পরিবার-পরিজন ছেড়ে পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে, ফি দিতে না পেরে শিক্ষার সুযোগ হারাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা, চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে কত শত মানুষ। এ সব নিয়ে দেশের শাসকরা বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। তারা কৃষি-বাজেট, শ্রম-বাজেট কিংবা শিক্ষা-স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দ দিনের পর দিন কমিয়ে চলেছে। অজুহাত দিচ্ছে, সরকারি কোষাগারে অর্থের অভাবের, অথচ সামরিক বাজেট বাড়িয়েই চলেছে। পূর্বের কংগ্রেস বা বর্তমানের বিজেপি উভয় সরকারই যখন-তখন পাকিস্তান-জুজু দেখিয়ে সামরিক বাজেট বাড়িয়ে চলেছে। এমনকী বাজেট বহির্ভূত খরচও বাড়িয়ে চলেছে।

দেশের সাধারণ মানুষের পরিস্থিতির কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে ‘আত্মনির্ভর ভারত’ গড়ে তোলার জিগির তুলে দেশের অভ্যন্তরে অস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি করার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগোচ্ছে বিজেপি সরকার। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক আগামী পাঁচ বছরে দেশীয় কোম্পানিতে ২৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, এর মধ্যে ৫ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধাস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করার টার্গেট রয়েছে। ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ স্লোগান দিয়ে বিজেপি নেতারা ভারতকে সামরিক দিক থেকে আরও শক্তপোক্ত করার অঙ্গীকার করছেন। এর জন্য ২০২৩-২৪ বর্ষে সামরিক খাতে বরাদ্দের ৭৫ ভাগ ধার্য করা হয়েছে দেশীয় কোম্পানিতে যুদ্ধাস্ত্র তৈরির জন্য। বেসরকারি কোম্পানি এবং স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলিকে এর বরাত দেওয়া হয়েছে। অনিল আম্বানির রিলায়েন্সকে মহারাষ্ট্রের মিহানে সমরাস্ত্র তৈরি করার এবং সেগুলি বিশ্বের যে কোনও দেশে বিক্রির ছাড়পত্র দিয়েছে সরকার। জানা গেছে, ২০১৫ সালে রাশিয়ার এক অস্ত্র উৎপাদক সংস্থার সাথে আম্বানির করা যুদ্ধ-বিমানের আক্রমণ প্রতিরোধী অস্ত্র তৈরির চুক্তিতে মধ্যস্থতা করেছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর ক্রেতা হচ্ছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। বিজেপি ঘনিষ্ঠ আদানিও ইজরায়েলের অস্ত্র কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগে সমরাস্ত্র তৈরির ব্যবসায় নেমেছে (টাইমস অফ ইন্ডিয়া -৫ আগস্ট, ২০২২)। অস্ত্র উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়ার বাসনায় ভারত সমরাস্ত্র রপ্তানিও বাড়িয়েছে। সেজন্য ২০২২-২৩ এ ভারতের রপ্তানি খাতে খরচ ধার্য হয়েছে ১৬ হাজার কোটি, যা ইদানীং কালের মধ্যে সর্বাধিক। সরকারি সূত্রে খবর, ২০১৬-১৭ সালের থেকে রপ্তানি বেড়েছে ১০ গুণেরও বেশি।

বিশ্বে সামরিক দিক থেকে অন্যতম শক্তিশালী দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে উঠেপড়ে লেগেছে ভারত। সেজন্য ভারত আমেরিকার সাথে যৌথভাবে সামরিক মহড়া দিচ্ছে। মোদি সরকার বিশ্বের মধ্যে প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে আগামী দশকে এই খাতে ২৫০ বিলিয়ন ডলার খরচের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সংকটকে ধামাচাপা দিতে এবং অর্থনীতিকে আপাত চাঙ্গা রাখতে যুদ্ধের জিগির তোলা একান্ত প্রয়োজন আজ আমেরিকা থেকে ভারত— প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের শাসকের। বাজার সংকট আজ প্রতি মুহূর্তের সংকটে পরিণত হয়েছে। বর্তমান পুঁজিবাদী সংকটের সমাধান বা এর থেকে বেরিয়ে আসার কোনও দাওয়াই দিতে পারছেন না বিশ্বের তাবড় অর্থনীতিবিদরা। সংকটগ্রস্ত মানুষ ক্রমশই আরও সোচ্চার হচ্ছেন এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলছেন। শাসকরা একদিকে অন্য দেশের উপর তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে, অন্যদিকে মুমূর্ষু পুঁজিবাদী বাজারকে কিছুটা হলেও চাঙ্গা করতে অস্ত্রকে পুঁজি করছে। ফলে যুদ্ধ পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিবার্য পরিণাম। অবক্ষয়িত স্তরে পুঁজিবাদ যুদ্ধ ছাড়া বাঁচতে পারে না। অর্থনীতির সামরিকীকরণ করা তাই অনিবার্য হয়ে উঠেছে— অস্ত্র উৎপাদনে শীর্ষ দেশ আমেরিকা কিংবা ভারতের মতো অস্ত্র উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে চাওয়া ভারতের শাসকদের কাছে। তাই ইতিমধ্যেই যুদ্ধে বিধ্বস্ত বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের যুদ্ধ বন্ধের করুণ আবেদন শাসকদের কানে পৌঁছচ্ছে না অথবা তারা শুনেও না শোনার ভান করছেন। একমাত্র যুদ্ধবিরোধী মানুষের সংঘবদ্ধ লড়াই-ই আনতে পারে যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী।

কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষে

ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি সভা

৯ জুলাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেকানন্দ হলে দলের বিজ্ঞানকর্মীদের সভায় বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গাঢ় অন্ধকারে আলোর নিশানা

অতীতের পথে হেঁটে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে পেশির জোরে বুথ দখল, ব্যালট ছিনতাই, বোমা-গুলির অবিরাম বর্ষণে রক্তে ভিজে যাওয়া মাটির আঁশটে গন্ধ আর স্বজনহারাদের বুকফাটা আর্তনাদ। মানুষ আকুল হয়ে ভাবছে, গণতন্ত্রের নামে এই বন্য বর্বরতার কি শেষ হবে না!

গভীর এই অন্ধকারেও পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলার কিছু ঘটনা কিন্তু আশার আলো দেখিয়ে যায়। বলে যায়, মানুষের শুভবুদ্ধির উপর বিশ্বাস হারাতে নেই। যত শক্তিশালীই হোক, অনৈতিকতার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা শাসকদল-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব আর দলদাস পুলিশ-প্রশাসনের নীতিহীন আনুগত্যই শেষ কথা নয়। সঠিক নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ যদি একজোট হয়, তাকে পদানত করার ক্ষমতা কারও নেই।

যেমন, মুর্শিদাবাদে সুতির অরঙ্গাবাদের একটি বুথের কথাই ধরা যাক। গ্রামসভার নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র আয়েশা বিবি। বহু দিন ধরে দলের কাজকর্ম দেখে এলাকার মানুষ এবার তাঁকেই ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রচারপর্বের শেষের দিকে অন্য দলের কাছেও সে বার্তা বোধহয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাতেই দুষ্কৃতীরা তৎপর হয়ে ওঠে। প্রস্তুতি নিতে থাকে তাণ্ডব চালিয়ে ভোট লুটের। আর এ সংবাদ পাওয়ামাত্র শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যান গোটা গ্রামের মানুষ। যে ভাবেই হোক ভোট-লুট আটকাতে হবে। ভোটের দিন এস ইউ সি আই (সি) -র নেতৃত্বে তৈরি হয়েই ছিলেন তাঁরা। সচেতন ছিল মহিলা-বাহিনী। দুষ্কৃতী হামলা হলে প্রথমে আটকাবেন তাঁরাই। নারী-বাহিনীর পিছনে খাড়া পাহাড়ের মতো প্রতিরোধ গড়ে সতর্ক পাহারায় ছিলেন গ্রামের বলিষ্ঠ তরুণ-যুবকদের দল।

সম্মিলিত প্রতিরোধের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার খবর চলে গিয়েছিল ঠিক জায়গায়। ফলে সেদিন নির্বিঘ্নে মিটে যায় ভোটপর্ব। এলাকার মানুষের বিপুল সমর্থনে গ্রামসভাটিতে জয়ী হন এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী আয়েশা বিবি।

মুর্শিদাবাদেই বহরমপুর ব্লকের লোকপুর গ্রাম। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ও তার এজেন্ট ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে সাধারণ মানুষই তা রুখে দেন। এমন সময় খবর আসে পাশের গ্রামগুলিতে ভোট লুটে নেমে পড়েছে দুষ্কৃতীরা। চালাচ্ছে যথেচ্ছ রিগিং, ছাপ্পা। লোকপুরে শাসক দলের নেতারা ফোন করে গুণ্ডাবাহিনীকে গ্রামে ডাকতে থাকে। জানতে পেরে চুপ করে বসে থাকেননি এস ইউ সি আই (সি)-র স্থানীয় সংগঠকরা। ভোটলুট প্রতিরোধে সাধারণ মানুষ সহ বিরোধী দলের কর্মীদের সক্রিয় হতে আহ্বান জানান তাঁরা। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ একজোট হয়ে বুথের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যান। ঘোষণা করেন, বাইরে থেকে কোনও গুন্ডাবাহিনীকে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না। নাগরিক প্রতিরোধের বলিষ্ঠ চেহারা দেখে পিছিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। নির্বিঘ্নে শেষ হয় ভোট।

মানুষের শুভবুদ্ধির জয়ের এমনই একটি ছবি দেখা গেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়েও। সেখানকার কুশবসান পঞ্চায়েতের ডাঙ্গরপাড়া গ্রামসভায় দীর্ঘ দিন ধরে জিতে আসছে এস ইউ সি আই (সি)। সিপিএম-ফ্রন্ট আমলে যেমন, তেমনই তৃণমূল কংগ্রেসের আমলেও জয়ী হয়েছেন এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী। এবারের ভোটে যে কোনও মূল্যে এস ইউ সি আই (সি)-কে আটকাতে প্রার্থী জ্যোৎস্না মণ্ডলের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিল তৃণমূল-বিজেপির সঙ্গে সিপিএম-ও। মুখে একে অপরের বিরুদ্ধে আগুন-ঝরা স্লোগান দিলেও 'জনগণের জোট' নাম দিয়ে এই তিনটি দল একযোগে এক নির্দল প্রার্থীকে দাঁড় করিয়ে দেয়। কিন্তু এলাকার জনগণ যে নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে এস ইউ সি আই (সি)-র প্রার্থীর উপরেই আস্থা রেখেছিলেন, ভোটের ফলে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। তৃণমূল, বিজেপি ও সিপিএমের পারস্পরিক বিষ-উদগীরণ যে নিতান্তই লোক-দেখানো, ডাঙ্গরপাড়া গ্রামসভার নির্বাচনে স্পষ্ট হয়ে যায় তা-ও। গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে এই গ্রামসভায় এস ইউ সি আই (সি) সদস্যদের দক্ষ ও স্বচ্ছ কার্যকলাপ এবং নীতিনিষ্ঠ আচরণ দেখে আসছেন এলাকার মানুষ। তাই তাঁরা সমর্থন করেছেন এই দলটিকেই। এর বিরুদ্ধে ওই তিন ভোটবাজ দলের অশুভ জোটকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় কুলতলীর মেরিগঞ্জ-১ অঞ্চলে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা ভোটের দিন গুলি চালিয়ে ভোটারদের সন্ত্রস্ত করতে চেয়েছিল। প্রতিরোধ করতে গিয়ে ১১ জন এস ইউ সি আই (সি) কর্মী গুলিবিদ্ধ হন। এর পরেও রুখে দাঁড়িয়ে এলাকার মানুষকে পাশে নিয়ে লড়েছেন দলের কর্মীরা। ভোট লুট যতটা আটকানো গেছে তাতেই ছ'টি গ্রামসভা এবং একটি পঞ্চায়েত সমিতির আসনে জয়ী হন এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা।

পূর্ব মেদিনীপুরের বল্লুক-১ অঞ্চলেও বিজেপি-সিপিএম-তৃণমূলের ঘোষিত-অঘোষিত জোট সত্ত্বেও এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা পাঁচটি আসনে জয়ী হন। বেশ কয়েকটি আসনে জয়ী প্রার্থীর সঙ্গে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান মাত্র তিন বা চার। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে জেলায় জেলায় প্রতিরোধের এমন বহু ঘটনার সাক্ষী রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ।

এমন ভাবেই এ বারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যজোড়া সন্ত্রাস ও গণতন্ত্রহীনতার অন্ধকারে এখানে ওখানে মাথা তুলেছে আলোর নিশানা। অন্যায় দাপটের সামনে মাথা না ঝোঁকানোর দৃঢ়পণে যেখানেই সঠিক নেতৃত্বে জোট বেঁধেছেন মানুষ, সেখানেই ব্যর্থ হয়েছে ভোট লুটের ষড়যন্ত্র।

বই প্রকাশ অনুষ্ঠান

২৯ জুলাই গণদাবীর ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রকাশিত হবে
প্রথম প্রধান সম্পাদক
দলের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটবুরো সদস্য
কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর
নির্বাচিত ভাষণ ও রচনা
স্থান ঃ কেন্দ্রীয় অফিস (হলঘর) সময় ঃ বিকাল ৪টা
উদ্বোধক ঃ কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, পলিটবুরো সদস্য
(অনলাইনেও অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে)

হরিয়ানায় বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারি অপদার্থতার তীব্র নিন্দা

অতিবৃষ্টির কারণে হরিয়ানার আম্বালা, যমুনানগর, কুরুক্ষেত্র, গুড়গাঁও সহ আরও কয়েকটি এলাকার পরিস্থিতি সঙ্কটজনক। রেওয়াড়ির ধারুহেড়া অঞ্চলে বৃষ্টির জল ও কল-কারখানা থেকে রাসায়নিক যুক্ত বিষাক্ত জল জমে যাওয়ায় মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য, দলের হরিয়ানা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সত্যবান এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে ১২ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেছেন, শুধু উপদেশ দেওয়া বন্ধ করে সরকার যেন মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তিনি বলেন, নিছক প্রকৃতির উপর দায় চাপিয়ে এই সরকার জনজীবনের প্রতি নিজের উদাসীনতা ঢেকে রাখতে পারে না। বেশ কিছুদিন আগেই আবহাওয়া দফতর বৃষ্টির সতর্কতা জারি করলেও সরকার আগে থেকে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। জল জমে বন্যার মতো অবস্থা প্রায় প্রতি বছরই তৈরি হয়। অথচ এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের কোনও পরিকল্পনাই নেই। রাজ্যের অধিকাংশ এলাকাতেই রাস্তাঘাট, পার্ক, সরকারি ভবন জলমগ্ন। রেললাইন ও সড়কগুলি জলমগ্ন হওয়ায় বহু যাত্রী চরম অসুবিধায় পড়েছেন। হাজার হাজার একর কৃষিজমি কয়েক ফুট জলের তলায় ডুবে রয়েছে। জনজীবন বিপন্ন। এই অবস্থায় সরকার যেটুকু ব্যবস্থা নিয়েছে, তা অপর্যাপ্ত।

বিবৃতিতে কমরেড সত্যবান দাবি করেন, বন্যা পরিস্থিতিতে মানুষকে সুরাহা দিতে অবিলম্বে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। আটকে পড়া যাত্রী সহ বিপন্ন সমস্ত মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। অসুস্থ নাগরিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। বন্যা পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সরকারকে। পাশাপাশি বন্যাদুর্গত মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কমরেড সত্যবান রাজ্যের সাধারণ মানুষের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছেন।

'ব্রিগেড চলো, চলো কলকাতা'
রাজ্যে রাজ্যে প্রচারাভিযান

৫ আগস্ট ব্রিগেড সমাবেশ উপলক্ষে কর্ণাটকের মাইসোরে দেওয়াল লিখন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com